International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 94-99
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বাংলায় প্যান-ইসলাম আন্দোলন: ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরোধিতায় বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্র (১৯১৫-১৯২১)

নকুলেশ্বর মুখার্জী
গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

Abstract

The British government in India was responsive to the Indian Muslim community and helped Muslim intellectuals to modernise their society as well as the economic development of the Muslims in India. In the First World War Turkey had joined the opposition to Britain. At the time of world war, Muslims of India, particularly Muslims of Bengali intellectuals were facing two types of problems: (i) the friendly relationship with the British government and (ii) the question of Pan-Islam and Khilafat. Despite the British government's policy of conciliation, Bengali Muslims were forwarded to oppose the British because of the interest in 'Pan-Islamic' ideology and the honour of Khalifa and Turkey. Muslim nationalist leaders wanted to utilize the chance of engaging large scale with the Muslim community in the India's nationalist movement. Newspapers in Bengal, which was maintained by the Muslim intellectual have turned into anti-British during the period of World War I, as its opposite reaction British government were forced to change their attitude towards the Muslim community in India. The main objective of the present study is to analytical assessment of the British oppositional politics of the Bengali Muslim press and Bengali Muslim intelligentsia for the interest of the spread of 'Pan-Islamic' ideology during the study period.

Key Words: Bengali Muslims, Muslim Press, Pan-Islam, Bengali Press, Newspaper in Bengal.

ভূমিকা : বাংলার প্যান-ঐস্লামিক আন্দোলন ছিল মুসলিম ভূখন্ডগ্রাসের ইউরোপীয়দের নির্লজ্জ প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। এর সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮৭৭-৭৮ খ্রিষ্টাব্দের তুরস্ক-রাশিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। এই যুদ্ধের বাস্তবায়নের পর বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রান্তের মুসলিমদের মনে যে ভীতি জন্মেছিল তা হল- 'ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের ক্রমঃআগ্রাসনের ফলে ইসলামের সীমানা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে উঠবে'। তুরস্ক যখন যুদ্ধে বিজড়িত হয়ে পড়ে তখন বাংলার মুসলিমরা অর্থ সংগ্রহের মধ্যদিয়ে তুরস্কের সহায়তাদানেই ক্ষান্ত থাকেনি, তুরস্কের সাফল্য কামনায় অভূতপূর্ব জয়োল্লাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল।[১] তুরস্ক ছিল মূলত: সুন্নি মুসলিম আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সুতরাং ইসলামকে রক্ষা করতে হলে তুরস্ককে রক্ষা করতে হবে- এইরূপ ধারণা ভারতীয় তথা বাঙালী মুসলিমদের মনে বদ্ধমূল ছিল সুদৃঢ়ভাবে। স্বভাবতই মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্যান-ইসলামী আদর্শকে সামনে রেখে তুরস্কের সমর্থনে অবতীর্ণ হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে।[২] ভারতে ব্রিটিশ সরকার অনুসৃত নীতি মুসলিম নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে ছিল ইসলাম বিরোধী। আর এজন্যই তারা গান্ধীজীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলনে সামিল হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বাংলায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলিমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পর্বেই ভারতীয় মুসলিম সম্পর্কিত ব্রিটিশ নীতির সমালোচনায় ছিল মুখর। এমনকি তারা রক্ষণশীল ও ঐতিহ্যবাদী মুসলিম নেতাদের বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, যারা প্যান-ঐস্লামিক আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার স্বপক্ষে মতদান করেছিল।[৩] এই সমস্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পর্বে বাংলায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্রগুলিতে তুরস্কের সমর্থনে প্রচার চালাতে থাকে। যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'ইকদাম', 'তারজুমান', 'রিসালত্',

'নাকস্-সদাকত্', 'আল-হিলাল', 'জামহুর', 'মিল্লাত', 'অল-বিলাদ' এবং 'হাবলুল মাটিন'। এই সমস্ত সংবাদপত্রগুলিতে তুরস্কেও সমর্থনে যেভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা করা হয়েছিল তাতে অল-আফগানির রাষ্ট্র-ভিত্তিক প্যান-ঐস্লামিক চিন্তার প্রভাব ছিল স্পষ্ট। বর্তমান নিবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বাংলার সংবাদপত্রগুলি প্যান- ঐস্লামিক চিন্তাধারা প্রসারের ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য লাভ করেছিল। সেই সঙ্গে এটাও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে প্যান-ঐস্লামিক চিন্তাধারা ব্রিটিশ বিরোধিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও এবং প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে নি।

বিষয়ের আলোচনা : প্যান-ঐস্লামিক চিন্তা-ভাবনাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে বাংলার সংবাদ পত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মুসলিম নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলি উক্ত সময়কালে যে বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ভীতি প্রদর্শনের ফলে ইসলাম ধর্মের পরিসর কতখানি সংকীর্ণতর হয়ে উঠেছে- তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। ইসলাম ধর্মের রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গের বিরোধিতা করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।[৪] উদাহরণ স্বরূপ উর্দু ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদ পত্র সাফির এর নামোল্লেখ করা যেতে পারে; যেখানে ১৯১৫ খ্রীঃ এর আগষ্টমাসে 'Pan Islamism' নামে নিবন্ধে একথা বলা হয়েছিল যে, ইউরোপীয় সংবাদ পত্রগুলি, ইউরোপীয় সংবাদদাতা এবং ইউরোপীয় পর্যটকরা ঐস্লামিক রাষ্ট্রগুলি পরিদর্শনের পর প্যান-ইসলামের প্রেতচ্ছায়া দেখে এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে তারা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কণ্ঠরোধের জন্য যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ইউরোপীয়দের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিমদের প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত করে তোলে। তারা ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে এই মর্মে সাবধান করে দিয়েছিল যে, ইসলাম ধর্মে যে প্রগতিশীল আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে তা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একই সূত্রে গ্রথিত করে তাদের শক্তিশালী করে তুলবে যা ইউরোপীয়দের পক্ষে আদৌ শুভপ্রদ হবে না।[৫]

১৯১৫ খ্রীঃ এর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার উর্দুভাষী প্যান-ঐস্লামিক বুদ্ধিজীবীরা বেশ কিছু সংখ্যক উর্দু দৈনিক ও প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'ইকদাম', 'তারজুমান', 'রিসালত্', 'নাকস্-সদাকত্', 'আল-হিলাল', 'জামহুর', 'মিল্লাত', 'অল-বিলাদ' এবং 'হাবলুল মাটিন'। এগুলি ছিল ব্রিটিশ বিরোধী এবং তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিশীল। এদের এক ও অন্যতম লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহানুভূতিকে যে কোন মূল্যে তুলে ধরা।[৬] ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় 'হাবলুল মাটিন'-এর সম্পাদককে ব্রিটিশ সরকার এই মর্মে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, তিনি ব্রিটিশ বিরোধী কোন কবিতা যেন তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ না করেন। সম্পাদক এই আদেশে কর্ণপাত না করার ফলে পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'অল্-বালাগ' -এর সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ প্যান-ঐস্লামিক আদর্শ সম্পর্কে যখন একটি প্রবন্ধ তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেন তখন ব্রিটিশ সরকার তাঁকেও একই সাবধান বানী শুনিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই সব রচনার জন্য আজাদ ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়েন এবং ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে আল-হিলালের ছাপাখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও ১৯১৫ সালে তিনি প্যান ইসলাম মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল-বালাঘ পত্রিকা প্রকাশ করেন। ।[৭]

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে আবুল কালাম মুসলিম ধর্মমত সম্পর্কিত 'দার-উল-ইরসাদ' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আজাদ দার-উল-ইরসাদ নামে এক শাস্ত্র চর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল, কোরানের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য মৌলভিদের উপযুক্ত শিক্ষাদান। বাস্তবিক ক্ষেত্রে দার-উল-ইরসাদে প্যান-ইসলাম মতবাদের অনুকূলে শিক্ষা দেওয়া হতো এবং ধর্মচর্চার নামে প্রচার করা হতো ব্রিটিশ বিরোধিতা ও বৈপ্লবিক আদর্শ। ১৯০৬ আজাদের ব্রিটিশ বিরোধী ভাবনায় সাহায্য করেছিল তৎকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল; সৈয়দ আহমদের সময়ে যা ছিল অনুপস্থিত। 'আল হিলাল' পর্বে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ব্রিটিশ বিরোধী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। আজাদ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্মের বৃহত্তর ধারণা প্রত্যেকটি ধর্মই অনুসরণ করে ভিন্ন ভিন্ন পথে। কিন্তু প্রত্যেকটি ধর্মের মূল লক্ষ্য এক। তিনি এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, ভারতীয় মুসলিমরা স্বাদেশিকতা এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে। ১৯১৬ খ্রীঃ এর মার্চ মাসে কলকাতা পুলিশের নজরে আসে যে আবুল কালাম তাঁর বিদ্যালয়ে যে ধরণের বক্তৃতা দান করেন তা ব্রিটিশ প্রশাসন বিরোধী। কলকাতায় নাখোদা মসজিদে ইমামের গৃহে শেরিফের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লিগও শেরিফের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। 'আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই-বাংলা'[৮] কলকাতায় শাখা প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে তুর্কী সুলতানের প্রতি এই মর্মে আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন যে, তিনিই হলেন ইসলামের খলিফা। ঢাকার মুসলিমরাও তুর্কী সুলতান তথা খলিফাকে সমর্থন দান করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পর্বে প্যান-ঐস্লামিক সমর্থকেরা অঞ্জুমানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রামীণ জেলাগুলিতে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।[৯] শুক্রবারে নামাজের দিনে অঞ্জুমানের সদস্যরা একদিকে প্যান-ঐস্লামিক আদর্শ

মসজিদে উপস্থিত মুসলিমদের সম্মুখে তুলে ধরত এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাতো৷ বাংলায় 'জিহাদ' শীর্ষক যে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় মুসলিমরা কিভাবে অত্যাচারিত হয়েছে এবং অধঃপতিত অবস্থায় এসেছে তা তুলে ধরা হয়েছিল৷ অবশ্য সমগ্র বাংলাব্যপী ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদের সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথাও তুলে ধরা হয়েছিল সুস্পষ্টভাবে৷[১০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গ তুরস্কের প্রতি যাতে দুর্ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১ শে সেপ্টেম্বর লক্ষৌতে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন আহ্বান করেন৷ এই সময় বাংলা থেকেও অনেক মুসলিম ব্যক্তিত্ব সম্মেলনে যোগ দেন৷ একইভাবে 'All India Muslim League' -এর বাংলা প্রাদেশিক সংগঠন কৃষ্ণনগর, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, মালদা, ফরিদপুর, রামপুরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে সভা পরিচালনা করে৷[১১] খলিফার অবস্থা যাতে কোনভাবেই পরিবর্তিত না হয় সে জন্য ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭-ই অক্টোবর কলকাতার মুসলিম দোকানদারদের দোকান বন্ধ রাখার অনুরোধ জানানো হয়৷ এই সময় মহম্মদি পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা মহম্মদ আক্রম খান হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীদের ধর্মঘটের যে ডাক দিয়েছিলেন তাতে হিন্দুরা সাড়া দিয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে৷ সামগ্রিক বিষয়টির তত্ত্বাবধান করেন আলীগড়ের 'উর্দু-এ-জুয়াল্লা'- র সম্পাদক মৌলানা হসরত মহানি৷ তিনিও হিন্দুদের এই ধর্মঘটে শামিল হওয়ার অনুরোধ জানান৷ কলকাতায় খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ১৯১৯ খ্রীঃ এর ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার দিনটিকে খিলাফত দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়৷[১২] এ.কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে টাউন হলে যে সমাবেশের আয়োজন হয়েছিল তাতে খিলাফতের সমর্থনে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দশ-থেকে পনেরো হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিলেন।

বিশ্বযুদ্ধ পর্বে গুরুত্বপূর্ণ প্যান ইসলামিস্ট নেতৃবৃন্দকে ব্রিটিশ সরকার কারারুদ্ধ কওে রেখেছিল৷ হসরত মহানি, আলি ভাতৃদ্বয়, মুসির কিদয়াই, জান মহম্মদ ছোটানি, আবদুল্লা হারুণ, শাহ সুলেমান ফুলয়ারি, তাসাদুক আহমদ খান প্রমুখদের ব্রিটিশরা কারারুদ্ধ করে রেখেছিল এই কারণে যে তুরস্ক প্রশ্নে যাতে এই সমস্ত নেতৃবৃন্দ জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলতে না পারে৷ যদিও আব্দুল বারি, ড. আনসারি, আজমল খান প্রমুখরা রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতার পথই অবলম্বন করে চলেছিলেন৷[১৩] তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের গুরুত্ব পূর্ণ নেতার অভাবে এই সময় প্রকট হয়ে উঠেছিল৷ একমাত্র আবুল কালাম আজাদ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন৷ বাংলায় মুসলিম সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন৷ যদিও ইতিমধ্যে আক্রম খান, মুজিবুর রহমান, ইসলামাবাদী মুসলিম জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পথেই শুধু অগ্রবর্তী করেন নি; হিন্দু-মুসলিম ঐক্যেও মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ-কল্পে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনাও করেছিলেন৷

অক্রম খান চব্বিশ পরগনার হাকিমপুর অঞ্চল থেকে এসে কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন৷ তিনি কলকাতায় 'মহম্মদি' পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে উন্নতির বিষয়ে প্রচার চালাতে থাকেন৷ তিনি আবদুল রসুল, আবুল কালাম আজাদের মতই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন৷ ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন জাতীয়তাবাদী চেতনার তাগিদে, প্যান-ইসলাম সম্পর্কে তাঁর কোন দুর্বলতা ছিল না৷ বরং তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি, মাতৃভাষা(বাংলা)-র উন্নতির জন্যই কাজ করেছেন৷ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাষায় তুলে ধরেছিলেন৷ তিতি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশকে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের মাতৃভূমি হিসাবে এবং দুই সম্প্রদায়কে একই মায়ের দুই সন্তান বলে ঘোষণা করেন৷ এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, 'সাহিত্যের মধ্যদিয়ে হিন্দু-মুসলিম নিজের ভাতৃত্বকে প্রমাণ করবে'৷[১৪]

চট্টগ্রামের দূরবর্তী গ্রামীণ পটভূমিক থেকে শহরে এসে খিলাফত ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী৷ যদিও তিনি একজন ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু প্যান-ইসলাম তাঁকে আকর্ষিত করতে পারে নি৷ তিনি কলকাতায় মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতাদের সংস্পর্শে এসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং সার জীবন তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতিবাদ করে গেছেন৷[১৫] তিনি কলকাতায় 'অল ইসলাম' এবং 'সোলতান' নামে দুটি পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও হিন্দু-মুসলিম সৌভাতৃত্বের প্রচার চালিয়েছিলেন৷ ইসলামাবাদী শুধু হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উপরই জোর দেন নি, তিনি বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যও চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং বাংলাভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থও তিনি প্রকাশ করেছিলেন যেগুলি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সৌর্হাদ্য বাড়াতে অবশ্যই সাহায্য করেছিল৷ আবুল কালাম আজাদ বেশীর ভাগ সময়ে বাংলার বাইরে থাকার কারণে বঙ্গীয় খিলাফত কমিটির কার্যাবলী ক্রমশ শ্লথ হয়ে পড়ছিল৷ এরূপ পরিস্থিতিতে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুজিবুর রহমান এবং আক্রম খান সম্মিলিত ভাবে খিলাফত আন্দোলনকে বাংলার মফস্বল অঞ্চল

এবং গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং আক্রম খান, “tried to extend their influence in the Bengali Muslim society by patronizing religious publications. Ironically, such publications also created the environment for the emergence of some Muslims who asserted their right to interpret Islam for themselves, as opposed to accepting the interpretations of the ulama.”[১৬] ফলশ্রুতি হিসাবে বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে প্যান ইসলামের বদলে জাতীয়তাবাদী চেতনা গুরুত্ব পেয়েছিল অনেক বেশী মাত্রায়।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে খিলাফত আন্দোলন যে সুযোগ উন্মোচিত করেছিল তাতে তাদের ঐক্যবদ্ধ করণের কাজ সহজ হয়ে যায় এবং তারা উদ্বুদ্ধ হয় খিলাফতী ভাবধারা ও বিশ্বজনীন সৌভাতৃত্বের দ্বারা। খিলাফত আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেছিল। তিনি উপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিমদের গতিশীল করে তুলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বার্থে খিলাফতের প্রশ্নটিকে অসহযোগ আন্দোলনে বিজড়িত করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।[১৭] বাংলার নিম্নের জেলাগুলি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র দেশব্যাপী। বাংলা প্রেক্ষাপটে ‘প্যান-ইসলাম’ মুসলিমদের মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছিল দারুনভাবে। ব্রিটিশদের তুর্কী নীতি মুসলিম জনমানসে যে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল তাতে তারা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যেই রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলেনি, হিন্দুদেরও নিয়ে এসেছিল খুব কাছে।[১৮] ইংরেজরা তুরস্কেও অবমাননা না করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করেনি। বিষয়টি শুধু মুসলিম সম্প্রদায়কেই ক্ষিপ্ত করেনি, ব্রিটিশ সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেস এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দও খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজীকে মুসলিম সম্প্রদায়ের তরফ থেকে নেতৃত্বের আসন দান করা হয়েছিল। ১৯২০ সালের ১০ই মার্চ এক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে গান্ধীজী বলেছিলেন, “No cooperation is therefore the only remedy open to us. It is the clearest remedy as it is the most effective, when it is absolutely free from violence. It becomes a duty when cooperation means degradation or humiliation, or an injury to one’s cherished religious sentiment.”[১৯] রওলাট বিরোধী আন্দোলনের পর খিলাফত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি সারা ভারতের মতো বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার সংবাদপত্রগুলিতে খিলাফত প্রশ্নে হিন্দু সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চেয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকে। শুধু তাই নয় হিন্দু সম্প্রদায় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিও এই সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থনে ব্রিটিশ বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠে।

খিলাফত আন্দোলনে বাংলার সংবাদপত্রগুলি পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এগুলির মধ্যে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত ‘দ্য মুসলমান’ এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ‘মহম্মদি’ জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে ‘অল ইসলাম’, ‘ধূমকেত’, ‘নবযুগ’, ‘সোলতান’, ‘মোসলেম ভারত’ প্রভৃতি বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল এবং এই রাজনৈতিক চেতনা ছিল জাতীয়তাবাদী। ‘দ্য মুসলমান’ পত্রিকায় আন্দোলনের খবর শুধু নয়, নেতাদের বিবৃতিও প্রকাশ করা হত। তবে খিলাফত - অসহযোগ চলাকালীন পর্বে মুসলিম ছাত্র সম্প্রদায় বিরাট ভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি। এমনকি বিদেশী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় বয়কটের দিকেও যায় নি। এই ব্যাপারে মুসলিম সংবাদপত্র এবং জাতীয়তাবাদ মুসলিম নেতৃত্বও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে নি।[২০] তবে ‘অল ইসলাম’ পত্রিকায় খিলাফত আন্দোলনের স্বপক্ষে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে খিলাফত প্রসঙ্গকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে বিবেচনার পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, বাঙালী মুসলিমরা সেই সমস্ত বিষয়ে কোন ভাবেই সহযোগিতা করবে না যা তাদের ধর্ম, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতীয়তাকে ক্ষতি করবে।[২১]

যদিও তুরস্কের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাতেও সাফল্যের মুখদর্শন করেনি। তা সত্ত্বেও এ কথা বলা যেতে পারে যে, এর মধ্যদিয়ে মুসলিমদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল এবং বাংলার মুসলিমদের সঙ্গে উত্তর ভারতের মুসলিমদের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলায় মুসলিম উলেমা এবং মৌলভীরা অহিংস-অসহযোগের প্রচার চালিয়েছিল বাংলার গ্রামে- গঞ্জে। ফলশ্রুতি হিসাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, খিলাফতীদের এই ব্রিটিশ বিরোধিতা দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করেনি; এমনকি হিন্দুদের সঙ্গে তাদের এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিপান চন্দ্রের দৃষ্টিতে ‘... খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী মুসলমান জনসাধারণ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চিন্তাধারা অথবা ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের মত রাজনৈতিক সংগঠনের আধুনিক নীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তার বদলে রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক সমস্যায় ধর্মীয়

দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ বৈধতা ও স্থায়িত্ব পেল।'[22] তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে খলিফা পদের অবলুপ্তি এবং জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের 'বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদী' তে উত্তীর্ণ হতে না পারার ফলশ্রুতি হিসাবে অধিকাংশ খিলাফত নেতৃত্বকে পুনরায় মুসলিম লীগের ছত্রছায়ায় ফিরিয়ে আনে। জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতার পরিণতি হিসাবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম লীগ রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পায়।[23]

উপসংহার : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটিশ বিরোধী পক্ষে যোগদান করায় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষভাবে বাংলার বুদ্ধিজীবী মুসলিমরা উভয়সঙ্কটে পড়েছিল। একদিকে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠনে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ মদত এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের মুসলিম তোষণ নীতি সত্ত্বেও প্যান-ঐস্লামিক ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে তুরস্কের সম্মান রক্ষার তাগিদে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশ বিরোধিতায় অগ্রবর্তী হয়েছিল। সেই সঙ্গে মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গতি সঞ্চার করতে চেয়েছিল। যদিও গান্ধীজীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন সত্ত্বেও ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ বিরোধিতাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলস্রোতে প্রবেশ করাতে পারে নি। মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাদের পত্র- পত্রিকার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল প্যান-ইসলামকে হাতিয়ার করে। কিন্তু তুরস্কের রাজনৈতিক পালাবদল বিশেষত: কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক খলিফা পদের অবলুপ্তি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের হতোদ্যম করে দেয়। স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধিতার যে সুযোগ এনে দিয়েছিলেন বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাকে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে নি।

তথ্যসূত্র :

১) দে অমলেন্দু, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৭৭।

২) Ahmed Sufia, *Muslim Community in Bengal 1884-1912*, Dacca University, Bangladesh, 1974, p. 204.

৩) ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মিহির ও সুধাকর পত্রিকা, ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম প্রচারক পত্রিকা এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছিল যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলেই মুসলিমরা নিশ্চিন্ত হয়েছে। নচেৎ তারা শিখ ও মারাঠাদের অমানবিকতার ফল ভোগ করত। ইসলাম প্রচারক-এ কংগ্রেসের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছিল যে, মুসলিমরা কংগ্রেসকে কখনই নিজেদের সংগঠন বলে অভ্যর্থনা জানায়নি। নবানুর এবং কোহিনুর পত্রিকাতেও ব্রিটিশদের সমর্থনে এবং জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালানো হয়েছিল। - Dey Amalendu, *Op.Cit.*, pp. 29-31.

8) Sanyal Usha, *Deoband Islam and Politics in British India*, Oxford University Press, Bombay, 1996, pp. 286-289.

৫) *Ibid.*

৬) হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে বিরোধ সৃষ্টি না হয় সেজন্য বালাক (১৯০১, সাপ্তাহিক, বরিশাল), ভারত সুহৃদ(১৯০১, মাসিক, বরিশাল) পত্রিকার মাধ্যমে এ.কে. ফজলুল হক এবং নিবারণ চন্দ্র দাস উক্ত সময়কালে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।- Dey Amalendu, *Op.Cit.*, p. 76.

৭) Qureshi M. Naeem, *Pan-Islam in British Indian Politics: A Study of the Khilafat Movement, 1918-1924,* Brill Academic Pub, Singapore, 1999, p.66-67.

৮) রায় বেরলির সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইল কর্তৃক প্রবর্তিত তারিকা-ই-মহম্মদিয়া বা মহম্মদীয়াপন্থা নামক ধর্ম সংস্কার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর ১৮৫৭-এর বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের মুসলিম নেতৃবৃন্দ দেওবন্দপন্থী ও আলিগড়পন্থী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমোক্ত দলটি ইংরেজ বিরোধিতাকে তাঁদের সংগ্রামের অংশ হিসাবে ঘোষণা করেন এবং শিক্ষাব্যবস্থায় সনাতনপন্থা অবলম্বন করেন। মওলানা আক্রম খাঁ,

মওলানা মহম্মদ মনিরুজ্জামান, মৌলভি আবদুল্লা হেলবাকী, মৌলভি সহিদুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে ‘আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা’ নামে একটি উলেমা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম জ্ঞানহীন মুসলিমদের মধ্যে ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কিত চেতনা জাগ্রত করা এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন। ১৯১৯ সাল থেকে সংগঠনটি ‘জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা’ নামে ’জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ’- এর বাংলাদেশের শাখা রূপে কাজ শুরু করে।- দে, ড. সুনীলকান্তি, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা ও মুসলিম সমাজ ১৯১৩-১৯১৯, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১।

৯) তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬।

১০) Lahiri Pradipkumar, *Muslim Thought 1818-1947*, K.P. Bagchi, Kolkata, 1991, pp. 88-89.

১১) *Ibid*.

১২) ত্রিপাঠী অমলেশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

১৩) Qureshi M. Naeem, *Op.Cit.*, p.92.

১৪) চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’র সভাপতির ভাষণ; *সওগাত*, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, ১৯১৯, পৃ.২৯১-২৯৯।

১৫) Alam Abu Yusuf, *Khilafat Movement and the Muslims of Bengal*, Raktakarabi, Kolkata, 2007, p.154.

১৬) Dey Amit, “Bengali Translation of The Quran and the Impact of Print Culture on Muslim Society in the Nineteenth Century”, *Societal Studies*, Vol. 4, No.4, 2012, p.1303.

১৭) Tendulkar D.G., *Mahatma, Vol-I*, Publication Division, Ministry of Information and Broadcusting, Government of India, New Delhi, Reprint- 1988, pp. 284-285.

১৮) Lahiri Pradipkumar, *Op. Cit.*, pp. 89.

১৯) Bhogaraju Sitaramaiya Pattavi, *The History of the Indian National Congress*, Padma Publications, 1946, Bombay, 168.

২০) Qureshi M. Naeem, *Op. Cit.*, p.142.

২১) Ibid. p.143.

২২) চন্দ্র বিপান, *আধুনিক ভারতঃ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ* (শক্তি রাহা কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনুদিত এবং সৌরীন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত), কে.পি. বাগচী, কলকাতা, ২০০০, পৃ.২১৯-২২০।

২৩) Niemeijer Albert Christan, *The Khilafat Movement in India 1919-1924*, Martinus, Nijhoff, The Hague, Netherlands, 1972, p. 38.

*****